আমরা যখন বাঙ্গালি ছিলাম

মীজান রহমান

এক

একদা প্রচুর বাঙ্গালি ছিল এদেশে। সংখ্যায় নয়, মনমানসিকতায়। নাগরিকত্বে পাকিস্তানী হয়েও মনেপ্রানে ছিলাম পদ্মাযমুনার পাড়ভাঙ্গা মাটির কাদায়-গোবরে একাকার হওয়া গেঁয়ো বাঙ্গালি। সংখ্যায় একেবারেই নগন্য, কিন্তু বাঙ্গালিত্বের আত্মগৌরবে অগন্য। সেসময় বাংলাদেশ ছিল না, সোনার বাংলার লালসবুজ পতাকা ছিল না, ছিল না রবিঠাকুরের গান গেয়ে নববর্ষকে বরণ করবার স্বাধীনতা। তবুও বাঙ্গালিত্বের বলিষ্ঠ পদচারণা ছিল অন্তরে। হাতেগোনা যেকটি মানুষ ছিলাম এখানে তারা সবাই বাঙ্গালি ছিলাম। আজকে ক্যানাডা-আমেরিকার পথেঘাটে বাংলাদেশী----অসংখ্য, অজস্র---খরস্রোতা বানের ধারায় প্রবাহিত মানবকূল। কিন্তু হায়, বাঙ্গালি কোথায়! আজকে এদেশে বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যা অগনিত, তবুও বাঙ্গালির সংখ্যা বিলুপ্তির পথে। সবার অলক্ষ্যে বাংলাদেশের 'বাংলা'টিই উধাও হবার উপক্রম।

দুই

ক্যানাডার অভিবাসী জীবনের ৪৮ বছর পার হয়ে গেল আমার। ১৯৬২ সালে সদ্য-বিয়ে-করা বউটিকে নিয়ে নিউব্রান্সুইকের রাজধানী ফ্রেডারিকটনের বিমানবন্দরে যখন নামলাম ক্যানাডিয়ান এয়ারলাইন্সের (সেসময় এয়ার ক্যানাডার এই নামই ছিল) ক্ষুদে প্লেনে করে, শেষ বিকেলের শীতল রৌদ্র তখন আমাদের ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। দুজনের মনে তখন একই প্রশ্ন। এ কোথায় এলাম আমরা? এ তো গ্রাম। প্লেনের প্রপেলার বন্ধ হয়ে যাবার পর সত্যি সত্যি যেন কানে এল ঝিঁঝিঁর ডাক। চারদিক নিঝঝুম নিশুতি। হেমন্তের পাতাদের গায়ে গেরুয়া রঙ ধরতে শুরু করেছে। এর নাম বিমানবন্দর? ঢাকার মোতালেব কন্ট্রাক্টারের বাড়িও তো এর চেয়ে বড়। সারা বিমানবন্দরে একটিমাত্র প্লেন---আমাদেরটি। গোটা বিশেক যাত্রী যে যার গন্তব্যে চলে যাওয়ার পর সব চুপচাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিভাগের বড়কর্তা স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের রিসিভ করতে। এয়ারপোর্টে কোনও মুটেবেয়ারা ছিল না। প্রফেসার এডওয়ার্ড নিজেই আমাদের মুটে হয়ে গেলেন---ভারি দুটো বাক্স দুহাতে নিয়ে রওয়ানা হলেন তাঁর পার্ককরা গাড়ির দিকে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম দেখে। এ কেমন দেশ রে বাবা, এয়ারপোর্টে মুটে নেই? বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় অধ্যাপককে দূরদেশ থেকে আসা নবনিযুক্ত তরুন লেকচারারের বোঝা বইতে হয়? বুঝলাম, আমার নিজের দেশ থেকে দূরে, অনেক দূরে এই দেশ, যেখানে বড় বড় জাঁদরেল অধ্যাপকও দরকার হলে মুটে হয়ে যায় অকাতরে।

প্রথম বছরটি ঘরের বাইরে একটি বাংলা শব্দ শোনা বা বলার সুযোগ হয়নি আমাদের। মনে হচ্ছিল যেন এক দীর্ঘ বনবাস--- মাতৃভাষা বিবর্জিত এক দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনা। দ্বিতীয় বছর ওপার বাংলার তিনটি ছাত্র এল----বসন্তকুমার দাস, বসন্তকুমার মাহাতো, প্রিয়ব্রত ঘোষ দস্তিদার। এতদিন পর কারো সঙ্গে বাংলা বলতে পেরে মনে হল বৃষ্টি নেমেছে দীর্ঘ খরার পর। দুমাস পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে এল অরূপকুমার দাশ। এসেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে

বসল। বৌদি বৌদি বলে অজ্ঞান। বৌদি ওকে রান্না শেখায়, আর আমি ওকে শেখাই মুরগির চামড়া ছাড়ানোর কায়দা। হ্যাঁ, সেকালে ওটুকুই ছিল আমার বিদ্যার দৌড়---কেমন করে একটানে মুরগির চামড়া ছাড়াতে হয়। কালে কালে অরূপ রান্নাবান্নাতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠল, দাদা-বৌদির সঙ্গে হল আরো ঘনিষ্ঠ। ওরা চারজন মিলে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আমাদের এপার্টমেন্টে আসত ভূড়িভোজন করে ঘন্টাকয়েক তাস পেটানোর জন্যে। ভাষার তাপে প্রানের তাপে গলে গেল আমাদের ধর্মের বেড়া, ভেঙ্গে গেল দেশভাগের কৃত্রিম দেয়াল। বিদেশবিভুঁয়ের বাংলাবিহীন অচিনপুরে আমরা ছয়টি সমমনা বাঙ্গালি একত্র হয়ে, একাত্ম হয়ে, হৃদয়ে-হৃদয়ে একাকার হয়ে, ভেদাভেদমুক্ত বাঙ্গালি হয়ে গেলাম। সারা ফ্রেডারিকটন শহরে এই ছজন বাঙ্গালিই কেবল। নগন্য সংখ্যা, কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বাঙ্গালি। শতকরা একশভাগ বাঙ্গালি। সেকালে বাঙ্গালি হওয়াতে বড় সুখ ছিল ভাই।

আরো দুবছর আমরা ছিলাম ফ্রেডারিকটনে। পরে আরো দুচারজন বাঙ্গালি ছাত্র এসে যোগ দিয়েছিল। তাদের নাম এখন আর মনে করতে পারছিনা। ক'জন হিন্দু ক'জন মুসলমান তা'ও মনে নেই। আসলে কে হিন্দু কে মুসলমান সেই বোধটুকুও তিনবছরের মেলামেশাতে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা। মানুষকে ওভাবে ভাগ করতে আমার রুচিতে বাধে। আমার ব্যক্তিগত মতে মানবজাতির সবচেয়ে অশুভ মুহূর্ত ছিল যখন তারা ধর্মের তকমা দিয়ে মানুষের পরিচয় নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ধর্মপরিচয় আর প্রাগৈতিহাসিক সমাজের গোত্র পরিচয়তে আমি কোন তফাত দেখিনা। দুটোই গরুর গায়ে গরম লোহা দিয়ে মালিকানাস্বত্বের সীল মেরে দেওয়ার মত। ধর্মপরিচয়ের প্রথম কাজই হল মানুষকে বিভক্ত করা। এই বিভক্তি যে কত রক্তপাত ঘটিয়েছে, আর সেই রক্তের ধারা যে কি অন্তহীন গতিতে বয়ে চলেছে ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার হিসেব ভুক্তভোগীরাও রাখেনি ভাল করে। বড় দুঃখ যে পরিচয়প্রতিষ্ঠার আগে ধর্মের পরিবর্তে ভাষার কথাটি ভেবে দেখেননি পূর্বসূরিরা।

১৯৬৫ সালে আমরা গাড়ি নিয়ে অটোয়াতে উপস্থিত হই---কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিভাগে এসিসটেন্ট প্রফেসারের পদে যোগ দেব বলে। প্রথম দিনের ক্লাসগুলো শেষ করে বাড়ি ফিরব এমন সময় করিডোরে দেখা এক বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সঙ্গে। পরিচয় দিলেন শফিকুল্লাহ বলে---ভূবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করছেন। পূর্ববঙ্গের মানুষ। দারুন নম্র প্রকৃতির লোক। আলাপ হতে না হতেই দাওয়াত করে বসলেন। ওই সন্ধ্যাতেই। স্ত্রীকে ফোন করে খবর দেওয়ার প্রয়োজনটুকুও বোধ করেননি। ইচ্ছে করে নয়, স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞাবশত তো অবশ্যই নয়, কেবলি তাঁর সরল সহজ ভালমানুষত্বের জন্যে। এবং আমাদের বাঙ্গালি হওয়ার জন্যে। এনিয়ে যে কত বকা খেতেন মনুর কাছ থেকে। মনু মানে শফিকুল্লা সাহেবের স্ত্রী, আমার স্ত্রীর সঙ্গে যার অসম্ভব ভাব হয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রতি উইকেণ্ডেই ওদের সেকেণ্ড এভেনুর বাসায় একবেলা খেতে যেতে হত। ওদের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল আরো দুজন পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালির সঙ্গে, তাদের নাম এখন আর মনে করতে পারছিনা। দুজনই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে ক্যানাডায় এসেছিলেন। তাঁদের একজন এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। দ্বিতীয়জন যুক্তরাষ্ট্রের চাকরি নিয়ে চলে যান দুবছর পর। তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি।

অটোয়াতে পৌঁছানোর একমাস পরেই এখানকার বাত্সরিক মেলা ল্যাণ্ডসডাউন পার্কে। সেখানে দেখা হল ডক্টর এণ্ড মিসেস সেনের সঙ্গে। একবছরের বাচ্চা মেয়ে রিনাকে বেবিক্যারেজে করে হাঁটছেন। অবধারিতভাবে বাঙ্গালি চেহারা বুঝে সাহস করে এগিয়ে গেলাম পরিচয় করার জন্যে। সেকালে বাংলা বলার সুযোগ পেলে আর যায় কোথায়। গায়ে পড়ে আলাপ জমানো কোনও ব্যাপারই ছিল না---সেটা আমরা সবাই করতাম। শান্তা সেন আর ডক্টর সেন আমাদের

আজীবন বন্ধু হয়ে থাকলেন। এখনও, পারুলের মৃত্যুর আট বছর পরও তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। ডক্টর সেন কৃতী বিজ্ঞানী, সরকারি চাকরিস্থলে সারাজীবন গবেষণাকর্মে লিপ্ত থেকে অবসর নিয়েছেন কয়েক বছর আগে। তাঁদের মাধ্যমে অটোয়ার একটা বড় বাঙ্গালিগোষ্ঠির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল অচিরেই। এক সন্ধ্যায় নাচগানের জলসা ডক্টর রবি দাশের বাড়িতে। সেখানে শান্তা নাচলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত হল বেশ কতগুলো। পরিচয় হল দাশগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে। পরিচয় হল তরুন মেধাবি ছাত্র রঞ্জন ব্যানার্জির সঙ্গে। পরবর্তিকালে আরো বহু পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, অনেকের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু মজার ব্যাপার যে সেই প্রথম দিককার পুরনো মানুষগুলির মত করে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক কেন জানি গড়ে উঠতে পারেনি অন্য কারো সঙ্গে।

'৬৬ সালে গণিতবিভাগে সংখ্যাবিজ্ঞানের এসিসটেন্ট প্রফেসার হয়ে যোগ দেন ডক্টর সালেহ। পরের বছর আসেন ডক্টর কবির----অবিবাহিত যুবক তখনও। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশ থেকে টুকটুকে বউ নিয়ে ফেরেন অটোয়ায়। পারুল, আমার স্ত্রী, নতুন বউকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করে তাঁদের মেডোল্যাণ্ডস ড্রাইভের ভাড়াকরা এপার্টমেন্টে। সেবছরই আমরা পার্কউড হিলসে বাড়ি কিনলে তাঁরাও বাড়ি কেনেন একই পাড়াতে। আমরা দুই পরিবার এক হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী ওঁদের দুই মেয়ে নিতা আর রুম্পার 'খালামনি'তে পরিণত হল। মিসেস কবির হলেন আমার ছেলেদের আন্টি। প্রতি উইকেণ্ডে তাসের আড্ডা বসত পরস্পরের বাসায়। প্রতি উইকেণ্ডেই একে অন্যের বাড়িতে খানাপিনার উদ্যোগ, কখনও বারবিকিউ, কখনও পটলাক, কখনোবা সবাই মিলে পিকনিকে যাওয়া। আস্তে আস্তে আরো বাঙ্গালি এলেন শহরে। ডক্টর এণ্ড মিসেস আহসানুল্লা, ফারুক সরকার ও তাঁর স্ত্রী সুজান, মিস্টার আলি ও জাহানারা আলি, ডক্টর এণ্ড মিসেস নাসিরুদ্দিন, মিস্টার এণ্ড মিসেস রহিম। সে যে কি সুখের সময় ছিল আমাদের। বলতে পারেন গানের কলির সেই 'সোনাঝরা দিনগুলো'র মত। গুটিকয়েক পরিবার আমরা এই দূরদেশের তুষারাচ্ছন্ন বাংলাশূন্যতায় পরস্পরের প্রীতিবন্ধনে, পরস্পরের গভীর রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতিপুষ্ট বাঙ্গালিত্ববোধের মাঝে এক মোহিনী ভুবন গড়ে তুলেছিলাম।

তারপর এল সেই ঝড়ের রাত----২৫শে মার্চ, ১৯৭১। তার আগের দিন পর্যন্তও আমরা ভাবিনি যে পাকিস্তান ভাঙ্গবে, ভাবিনি যে ৭ই মার্চের রমনামাঠের সেই উদাত্ত কন্ঠ সত্যি সত্যি গর্জিত হয়ে উঠবে সারা বিশ্বব্যাপী। ভাবিনি যে পাকিস্তান তার বন্য পশুগুলোকে লেলিয়ে দেবে সমস্ত বাঙ্গালি জাতির ওপর। ২৫ শে'র আগে আমরা কজন বাঙ্গালি মিলে এমনও ভাবছিলাম যে একটা পূর্বপাকিস্তান-ক্যানাডা সমিতি করলে কেমন হয়। কিন্তু ২৬ শে মার্চের দেশ-থেকে-আসা সিবিসির খবর সব ওলটপালট করে দিল। সংশয় রইলনা মনে যে আর নয়, আর থাকা যাবে না পাকিস্তানের সঙ্গে। ওরা মনুষ্যত্বহীন বর্বর জাতি। ওই সপ্তাহেই আমারা একত্র হয়ে একটা কর্মসূচি গঠন করে ফেললাম। সমিতি-টমিতি নয়, পুরোপুরি 'একশন' কমিটি----এখন আর কথা নয়, কাজ, এবং দ্রুত, তাত্ক্ষণিক কাজ। অনেকটা প্রবাস থেকে যুদ্ধ চালানোর মত। পূর্ববঙ্গের স্থানীয় বাঙ্গালিরা তো যোগ দিলেনই, পশ্চিমবঙ্গের জালালুদ্দিন সাহেবও এগিয়ে এলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। আজকের বাংলাদেশি যাঁরা আছেন তারা হয়ত জালাল সাহেবের নামও শোনেননি, কিন্তু '৭১ এর সেই দুর্দিনে তিনি ছিলেন আমাদের পরম বন্ধু। ক্যানাডার কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে তাঁর বেশ উঠাবসা ছিল রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্ন হোমরাচোমরাদের সঙ্গে। সেই সূত্রে আমরা এণ্ড্রু ক্রুইন আর হিথ ম্যাকুয়ারিসহ দুচারজন সিনিয়ার পার্লামেন্ট সদস্যের সান্নিধ্য লাভ করি এবং বাংলাদেশের দাবিদাওয়ার প্রতি

তাঁদের সহানুভূতি অর্জন করি। বড় কথা আমাদের নিজেদের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, এই গুটিকয় অটোয়াবাসী বাঙ্গালি, সেই প্রতিজ্ঞা থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি একমুহূর্তের জন্যে। প্রতিমাসে আমাদের আয়ের শতকরা পাঁচভাগ বরাদ্দ ছিল যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্যে (যা দেশের কোনও বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের কাছে পাঠাবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল), যাতে সোত্সাহে যোগ দিয়েছিলেন দুচারজন স্বল্পবিত্ত গ্র্যাজুয়েট ছাত্রও। একাত্তুর আমাদের প্রথমবার এবং, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শেষবারের মত একতাবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। জাতির দুর্যোগ প্রবাসী বাঙ্গালি সমাজে সৃষ্টি করেছিল এক আশ্চর্য উদ্দীপনা, এক অবিশ্বাস্যরকম সঙ্ঘবদ্ধতার চেতনা। এবং এই সংগ্রামে সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছিলেন আমাদের ওপার বাংলার আপনজনেরা। হ্যাঁ, আপনজন ছাড়া আর কিভাবে বর্ণনা করা যায় তাঁদের। ভারত যদি আশ্রয় না দিত শরণার্থীদের, আশ্রয় না দিত প্রাণের ভয়ে দেশছাড়া নেতানেত্রী মুক্তিযোদ্ধা আর বুদ্ধিজীবিদের তাহলে কি হতে পারত সেটা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। প্রবাসের প্রেক্ষাপটেও তাঁরা ছিলেন সমান সহানুভূতিশীল, কারণ ঐ ন'টা মাস আমরা সবাই বাঙ্গালি ছিলাম। ধর্ম যে মানুষকে ভাগই করে কেবল, মানুষ করে না, সেটা রক্তের দাগে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী। সময়ের ওই একটুখানি খোলা জানালা দিয়ে আমাদের দুই বাংলার মানুষই বুঝতে পেরেছিলাম যে ভাষা আর সংস্কৃতি মানুষে-মানুষে যতটা বন্ধন সৃষ্টি করে আর কিছুতে ততটা করেনা। বড় দুঃখ যে হৃদয়ের সেই উদার উন্মুক্ততা বেশিদিন টেকেনি-----ধর্মের রাজনীতি এসে তাকে রুদ্ধ করে ফেলেছে, যেমন করে করেছিল '৪৭ সালে, যেমন করে যুগ যুগ ধরে করে চলেছে দেশে দেশে।

একাত্তুরে আমাদের প্রাণে যে অনির্বান অগ্নিকুণ্ড স্বাধীনতার দুর্দম তৃষ্ণায় উত্তর আমেরিকার সকল জনপদ কম্পমান করে তুলেছিল তার দুর্বার তাড়নায় আমরা দল বেঁধে আন্দোলন করেছি, পাকিস্তানের হাই কমিশন অফিসে গিয়ে ওদের পতাকা পুড়িয়েছি, চীন আর যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে চিত্কার করে শ্লোগান দিয়েছি (এই দুটি দেশই তো পাকিস্তানকে উত্সাহ দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দৃঢ়হস্তে দমন করার জন্যে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলোর কথা না'ই বা বললাম, যেসব কথা বেমালুম ভুলে গেছেন আজকের নেতানেত্রীরা), নিউইয়র্কের জাতিসঙ্ঘের সামনে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করেছেন আমাদের স্থানীয় নেতারা, শোভাযাত্রা করেছি ক্যানাডা-আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরে। এটা অবশ্য ঠিক যে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু পাকিস্তানপ্রেমী বাংলাদেশি ছিলেন যারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিলেন একেবারেই নগন্য। ওটা ছিল 'জয়বাংলার' যুগ। একটা সময় ছিল কোথাও দেখা হলে আমরা পরস্পরকে 'জয়বাংলা' বলেই সম্ভাষণ জানাতাম। দুটি অসম্ভব সুন্দর বাংলা শব্দ একত্র হয়ে একটা উদাত্ত ঘোষণার আকার নিয়েছিল। আজকে এই একই শব্দ উচ্চারণ করার আগে এদিক ওদিক তাকাতে হয়, পাছে না কেউ শুনে ফেলে। আজকে এটা বাংলা শব্দ না হয়ে 'হিন্দু' শব্দে পরিণত হয়েছে। আজকে বাংলাভাষার অনেক শব্দই 'হিন্দু' ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছে!

প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল স্বাধীনতার। কিন্তু এতকাল পরেও প্রতি বছর ডিসেম্বর এলে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। একাত্তুরের ডিসেম্বরে সে কি অধীর অপেক্ষা আমাদের কখন পূর্ব পাকিস্তানে বোমারু বিমান পাঠায় ভারত। কেন এত দেরি করছেন তারা? আর কত বাঙ্গালিকে প্রাণ দিতে হবে অপেক্ষা করে করে? প্রবাসে বসে আমরা নখ কামড়াচ্ছি, দোয়াদরুদ পড়ছি,

মানতও করছি কেউবা। তারপর যখন সত্যি সত্যি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল সে কি উল্লাস আমাদের। আর আজ? আজ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ তাদের জাতীয় জীবনের যত দুঃখদুর্দশা সবকিছুর জন্যেই দোষারোপ করে ভারতকে। গেল ফেব্রুয়ারিতে দেশে গিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষদের ভেতরে এই একই মনোভাবের ব্যাপকতা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা জাতির ইতিহাসজ্ঞান এতটা বিকৃত হয়ে যায় কেমন করে তিন দশকের মাঝে? এ কি অন্ধকূপে নেমে গেলাম আমরা?

যুদ্ধের ন'মাস অটোয়ার ভারতীয় বাঙ্গালিদের সঙ্গে যে সহজ সুন্দর একটা ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে উঠেছিল আমাদের তা বজায় থাকে আরো কয়েক বছর। বলতে গেলে '৭৫ এর আগ পর্যন্ত। ওঁরা 'দেশান্তরি' নামক একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করেছিলেন। যুদ্ধের পর তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন তাতে যোগ দিতে। এতে আপত্তির কিছু দেখিনি আমরা---ওটা তো ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না, ছিল বাঙ্গালি প্রতিষ্ঠান। সেসময় এমনই মুক্তমনা ছিলাম আমরা, এবং এতটাই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব যে যোগ দেওয়াতে কোনও দোষ আছে বলে মনে হয়নি কারুর। একবছর পর আমাদের মাঝে থেকেই একজনকে তাঁরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করলেন---ডক্টর আহসানুল্লা, যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন বরাবর। তাঁর মেয়াদ শেষ হবার পর আরো একজন বাংলাদেশিকে প্রেসিডেন্ট করা হল---ডক্টর রফিকুর রহমান। সে এক অসম্ভব সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের সময় ছিল দুই সম্প্রদায়ে। আমাদের ধর্মীয় পরিচয়কে ছাড়িয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়---আমরা বাঙ্গালি। আমরা রবিঠাকুরের গান গাই। আমরা লালন ফকিরের গানে বিভোর হয়ে যাই, নজরুলগীতি আমাদের পাগল করে। সময়টা এমনই অসাধারণ ছিল তখন যে আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতেও পরস্পরের আসাযাওয়া আর প্রীতিবিনিময় ব্যতিক্রম না হয়ে স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়ে যায়। সে ছিল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর স্বর্ণযুগ। কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও আমরা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে সদিচ্ছা থাকলে 'সাম্প্রদায়িকতার' মত একটি দুষ্ট স্খলিত ব্যাধিকে জয় করা সম্ভব বৈকি। সেই দিনগুলো আজকে দীর্ঘশ্বাসের ক্ষতচিহ্ন ছাড়া কিছু নয়।

যুদ্ধের পর পর বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু ছাত্র এবং চাকুরিজীবি এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। মন্ট্রিয়ল থেকে এলেন মেসবাহুদ্দিন ফারুক ও তাঁর রূপসী স্ত্রী সেলিনা। এলেন মঞ্জুর হক ও তাঁর স্ত্রী সেলিনা মঞ্জুর। এলেন ডক্টর মকসুদুর রহমান এবং তাঁর সুনিপুন নৃত্যশিল্পী স্ত্রী সাইদা। ছাত্রদের মধ্যে আমার কনিষ্ঠ ভাই মাহফুজ, শামসুর রহমান মজুমদার, ইউসুফ, রহিম, এবং আরো ক'জন। সহসাই একটা লক্ষণীয় বাংলাদেশি সমাজ গড়ে উঠল অটোয়া শহরে। ছেলেমেয়ে সব মিলিয়ে প্রায় ষাটসত্তুরে পৌঁছে গেলাম আমরা। এবার একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ভাবনা জাগতে শুরু করে আমাদের মনে, যার মূল উদ্দীপনাটি ছিল ডক্টর রফিকুর রহমানের। সাংস্কৃতিকভাবে অসম্ভব বাঙ্গালিমনা হয়েও 'বাংলাদেশ' নামক সদ্যস্বাধীন হওয়া দেশটির প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ডরকম আনুগত্য ও ভালবাসা। সেটা অবশ্য আমাদের সবারই ছিল সেসময়, কিন্তু তাঁর মত করিতকর্মা আমরা কেউ ছিলাম না। আমরা কথায় চটপট, কাজে ঢিলে। উনি ছিলেন তার বিপরীত। বলতে গেলে তাঁরই উদ্যোগে একটা প্রতিষ্ঠান সত্যি সত্যি করে ফেললাম আমরা--- বাংলাদেশ-ক্যানাডা এসোসিয়েশন অফ অটোয়াভ্যালি। সংক্ষেপে 'বাকাওভ'। প্রথম বছর তার পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া হল ছাত্রদের ওপর----শামসুর রহমান মজুমদার হলেন সভাপতি, মোনায়েম সাধারণ সম্পাদক,

ইত্যাদি। আমাদের পরিকল্পনায় ছিল ছাত্ররাই চালাবে প্রতিষ্ঠানটি----এটা তো নতুন প্রজন্মেরই যুগ। তারপর দেখা গেল ওরা সবাই পড়াশুনা নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিলনা এসোসিয়েশনের জন্যে বাড়তি সময় দেওয়া যতটা প্রয়োজন ছিল। তখন অনেকটা অনিচ্ছাক্রমেই দায়িত্বটা আমাদের চাকুরিজীবিদেরই নিতে হল। '৭৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ডক্টর রফিক। ভীষণ উদ্যোগী মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর চিন্তায় সবসময়ই কেবল বাংলাদেশ আর বাঙ্গালি। তাঁর উত্সাহ-উদ্যোগে নিয়মিতভাবে আমাদের একুশে হত, বিজয়দিবস হত, হত রবীন্দ্রনজরুল জয়ন্তী। আমরা সরবে সগর্বে জাতীয় সঙ্গীত গাইতাম, গাইতাম 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। রফিকসাহেবের মাথা থেকেই বের হল 'বাংলাদেশ দিবসে'র আইডিয়াটি। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। সকালে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা----অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক। পুরো চারঘন্টাব্যাপী সেমিনার, যাতে অংশ নিয়েছিলেন কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এলিয়েট টেপার, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ওয়াহিদুল হক, ওয়াপদার ফারাক্কা-বাঁধ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে বিচক্ষণ প্রকৌশলী কে. এম. আব্বাস, এবং রফিকুর রহমান নিজে (তাঁর বিশ্বেষত্ব ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান)। অনুষ্ঠানের ভেনু হিসেবে আমরা ভাড়া করেছিলাম অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যানিয়ার হল, লেকচার রুম, ফয়ের ও মিলনায়তন। ফয়েরে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে বিপুল সহায়তা পেয়েছিলাম তখনকার হাইকমিশনার আতাউর রহমান সাহেবের কাছ থেকে----বিশেষত তাঁর ফার্স্ট সেক্রেটারি কাইয়ুম সাহেবের সহযোগিতা ছিল অসামান্য। সেই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিলেন পার্লামেন্ট সদস্য এণ্ড্রু ব্রুইন, যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় সাংবাদিক গোষ্ঠী। বিকেলবেলা ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান---নাচগান, বাদ্যবাজনা, কৌতুক, ফ্যাশান শো। সবই স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মেয়েদের উদ্যোগে। মন্ট্রিয়ল থেকেও দুচারজন শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন এতে। সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। সেটাও কোন পেশাদার বাবুর্চির দ্বারা করানো হয়নি, আমাদেরই ঘরের বউমেয়েরা নিজেদের খরচে তৈরি করে এনেছিলেন বাড়ি থেকে। তার মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ছাত্র রহিমের স্ত্রী রানু (মোস্তফা চৌধুরির স্ত্রী ছবির বড় বোন)ও ছিল। রানু-রহিমের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা আমাদের সকলেরই প্রাণ ছুঁয়ে গিয়েছিল। অসম্ভব মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ছিল আমাদের রানু। সেসব দিনের কথা ভেবে আজও মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। এ কি কেবলই স্মৃতিকাতরতা, না অন্যকিছু? স্মৃতির জন্যে কাতর হওয়া তো অবশ্যই আছে, তবে ওটাই সব নয়। অনুষ্ঠান অটোয়াতে এখনও হয়, কিন্তু সেগুলো কি বাঙ্গালি অনুষ্ঠান? শুনেছি 'বাকাওভ' নামক প্রতিষ্ঠানটি, যা গুটিকয় বাঙ্গালি মিলে গঠন করেছিলাম ১৯৭৩ সালে, তা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু গত এক দশকের মধ্যে তারা কোনও বাঙ্গালি অনুষ্ঠান করেছে এমন সংবাদ অন্তত আমার কানে পৌঁছায়নি। নিন্দুকেরা বলে, 'বাকাওভ'এর একজন স্বনিযুক্ত আমৃত্যু প্রেসিডেন্ট আছেন, শুধু প্রতিষ্ঠানটিই অস্তিত্বহীন। 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার'। সত্তুর আর আশির দশকে লোকসংখ্যা কম হলেও বাংলাদেশ ও বাঙ্গালি সংস্কৃতিকে ক্যানাডার মঞ্চে তুলে ধরার একটা তীব্র আকাঙ্খা ছিল আমাদের সবার মনে।

সেকালে আমরা সবাই বাঙ্গালি ছিলাম।

'৭৭ সাল থেকে আরো অনেক বাংলাদেশী বাঙ্গালির আগমন শুরু হয় অটোয়াতে। অত্যন্ত মেধাবী একটা ছাত্রদল প্রায় একই সময় এসে হাজির হলেন আমাদের মাঝে---সাজ্জাদুর রহমান,

মাহবুবুল আনম, জুলফিকার, জাহিন, তরফদার, আশফাক, এবং আরো ক'জন। মোস্তফা চৌধুরি আগেই ছিলেন অটোয়ায়, পরে বউ নিয়ে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন এখানে। ওঁর স্ত্রী ছবি ও জাহিনের স্ত্রী তহমিনার সুললিত গান, পরবর্তীতে আনমের স্ত্রী বিন্দুর ছায়ানট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত, মোস্তফা ও জুলফিকারের আবৃত্তি, এস এম ফারুকের অভিনয়, অটোয়ার বাঙ্গালি সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিল। বাঙ্গালি অনুষ্ঠানের জন্যে বাইরের কোনও শিল্পীর কথা ভাবতে হতনা আমাদের, নিজেদের শিল্পী দিয়েই পুরো অনুষ্ঠান সেরে ফেলা যেত। ব্যক্তিগতভাবে আমি দারুন ভক্ত ছিলাম ছবি আর তহমিনার বাংলা গানের। তারা এখনও অটোয়াতেই থাকেন, কেবল তাদের গানটিই নেই। কোথায় গেল সেই দিনগুলি? কোথায় সেদিন যখন আমরা নিজেদের বাঙ্গালি বলে পরচিয় দিতাম বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচিয়ে?

'৭৮ সালে রফিক সাহেবের মাথায় 'বাংলাদেশ দিবসের' চেয়েও বড় আইডিয়া প্রবেশ করে। সারা ক্যানাডাব্যাপী অনুষ্ঠান করতে হবে, শুধু অটোয়াবাসীদের নিয়ে নয়, এবং ছোটখাট অনুষ্ঠান নয়, পুরো দুদিনব্যাপী চলবে, যাতে থাকবে বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা, থাকবে বাংলা সংস্কৃতির শতমুখি ধারার বর্ণাঢ্য মঞ্চায়ন, থাকবে আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের বিবিধ সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে তাদের কি বক্তব্য সেটা তাদেরই মুখ থেকে শোনা, থাকবে ক্যানাডার বিভিন্ন প্রদেশের বাংলাদেশী-বাংগালি সম্প্রদায়ের পরস্পরের মাঝে মত ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ। যেমনি কথা তেমনি কাজ। রফিক সাহেব ছিলেন কাজের লোক। সরকারি মহলে তাঁর যথেষ্ট উঠাবসা ছিল বলে অনেক হোমরাচোমরাকেই তিনি চিনতেন। তাঁদের সঙ্গে তদবির দরবার করে দুই সরকার থেকে (প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়) ৩ হাজার করে ৬ হাজার ডলার অনুদান আদায় করে নিলেন। এ দিয়ে আমরা তিন 'রহমান' (রফিকুর রহমান, মকসুদুর রহমান আর আমি) মিলে একটা বড় আকারের সম্মেলনের আয়োজন করে ফেললাম। তাতে যোগ দিয়েছিলেন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া পর্যন্ত সকল প্রদেশের নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধিরা। পুরো তিনটি মাস আমরা তিনজন এবং রুহুল আমিন, সাজ্জাদ, জুলফিকার আর মজিদসহ বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা সম্মেলন দাঁড় করালাম। সেটা কতখানি সফল হয়েছিল সেটা আমার বলা উচিত হবে না, কিন্তু এই সম্মেলনই যে ছিল উত্তর আমেরিকার প্রথম ফোবানাজাতীয় বাংলাদেশি সম্মেলন সেটা হয়ত কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। এতবড় একটা সম্মেলন করার পরও সৌভাগ্যবশত আমাদের মধ্যে বড়রকমের কোন ভাঙ্গন দেখা দেয়নি তখনও। কারণ কখন আমরা সবাই বংগালি ছিলাম। ঐক্যবদ্ধ বংঙ্গালি।

তিন

আশির দশকের গোড়াতে অটোয়ার বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের কলেবর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং আরো সমৃদ্ধ। নাশিদ কামাল এল তার গানের ঝুলি নিয়ে। ফরিদ খান এলেন তাঁর উচ্চশিক্ষা ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার নিয়ে। মতিন ও নার্গিস আহমেদ এসেছিলেন তার কিছু আগেই। অবশ্য ইতোমধ্যে দুয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য চলেও গেলেন অন্যত্র----ডক্টর আহসানুল্লা ও মাসুদা

আহসানুল্লা গেলেন ব্রেজিলে, রফিকুর রহমান গেলেন নিউ ইয়র্কে জাতিপুঞ্জের চাকরি নিয়ে। বাকাওভ তখন খানিক দুর্বল হতে শুরু করেছিল নানারকম আভ্যন্তরীণ ভুলবোঝাবুঝির কারণে। ভাগ্যক্রমে ফরিদ সাহেব রাজি হয়ে গেলেন ঝড়ো হাওয়ার টলমলে তরীর হাল ধরে দাঁড়াতে। প্রথমত তিনি, তারপর মকসুদুর রহমান। মূলত এঁদেরই নেতৃত্বে বাকাওভ টিকে রইল আরো দেড়দশক। এই সময়টুকুতে যা কিছু অনুষ্ঠান হয়েছে, সবই ছিল আমাদের স্বদেশী, বাংগালি সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। আগেকার মত ছবি আর মনির রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি আর আধুনিক গান শুনে আমরা মুগ্ধ হতাম। পরে শিরিনসহ আরো দুচারজন কন্ঠশিল্পী এসে যোগ দিয়েছিল। নিতা, রুমেলা, আর কাজরির নাচ ছিল দর্শকদের কাছে বড়াই করে দেখাবার মত, আমাদের গর্ব। মনে আছে '৮৩ সালের ক্যানাডা ডে'র কথা। অটোয়ার মেজর্স হিলস পার্কের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে বাকাওভ একটি বাংলাদেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানে নৃত্য পরিবেশন করেছিল আমাদেরই তরুন নৃত্যশিল্পীরা----নিতা, রুমেলা, কনি, নাশিদ, কাজরি (হয়ত আরো দুয়েকজন ছিল যাদের নাম এখন আর মনে নেই)। সে যে কি গর্ব আমাদের। পার্লামেন্ট বিলডিঙ্গের পাশে বিশাল জনতার সামনে অসংখ্য মাইকের শব্দে ভেসে আসছিল বাঙ্গালি নৃত্যের আবহসঙ্গীত। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর বিপুল সেই জনসমুদ্রের উচ্ছ্বসিত করতালিতে মুখর হয়ে গিয়েছিল গ্রীষ্মের কবোষ্ণ বাতাস। ঐ মুহূর্তের তুলনা হয়না।

তখন বাংগালি হওয়াতে বড় সুখ ছিল ভাই।

বাকাওভের একটা সংবিধান ছিল। সংবিধান অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, ধর্মবৈষম্য----অর্থাত্ যেকোনরকম মানবিক বৈষম্যই ছিল আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে বাকাওভের প্রাক্তন সভাপতিদের মধ্যে তিনজন মহিলা ছিলেন----দু'জন বাঙ্গালিঃ মিসেস নার্গিস আহমেদ ও রাশেদা নাওয়াজ, এবং একজন শ্বেতাঙ্গিনী ক্যানাডিয়ান---ক্যাথি মোহাম্মদ। তিনজনই অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের কর্তব্য পালন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বাকাওভের সদস্য ও কর্মকর্তাদের মধ্যে নারীপুরুষের সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। তদুপরি ছিল বেশ কিছু হিন্দুধর্মাবলম্বি বাংলাদেশী। আমাদের অনুষ্ঠানাদিতে দ্বিতীয় প্রজন্মকে জড়িত করার প্রতি আমরা ছিলাম বিশেষ যত্নবান। কয়েক বছর আমরা ওদের জন্যে 'চিল্ড্রেন্স ডে'র আয়োজন করেছি, যেখানে ওরাই হত সব অনুষ্ঠানের আয়োজক উদ্যোক্তা নায়ক পরিচালক, সবকিছু। ওরা গাইত, নাচত, হাসিতামাশা করত, বাদ্যবাজনার আসর করত(সেকালে তো সব অভিবাসীর ছেলেমেয়েরাই একটা না একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারত)। দুয়েকবার তারা নিজেদের মধ্যে সেমিনার অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছিল, বড়দের উত্সাহ-উদ্দীপনায়।

সেসময় আমরা সবাই বাঙ্গালি ছিলাম। বাঙ্গালি হওয়ার একটা আলাদা আনন্দ ছিল।

এই বাঙ্গালিত্বের ঐতিহ্যটি অনেকবারই হুমকির সম্মুখীন হয়েছে নানাদিক থেকে, তবুও দেশের টানে, প্রাণে

র টানে সেটা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম সহস্রাব্দের শেষ অবধি। বন্ধুবর ফরিদ খানের আকস্মিক অকালমৃত্যুতে (১৯৯৭) খানিক বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও ফারুক ফায়সাল, সেলিম শের, এবং আরো অনেকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাকাওভ তার মূল চরিত্র অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়। অর্থাত্ হাজার বাধাবিপত্তি সত্বেও আমরা নতুন মিলেনিয়ামের সূচনা পর্যন্ত আমাদের বাঙ্গালিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলাম।

কিন্তু বেশিদিন পারিনি। অচিরেই ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল পূর্বাকাশ।

৪

বাঙালি ও বাঙ্গালিত্ব যে বিপন্ন হতে চলেছে তার আভাস দেখা দিয়েছিল '৭৫ সালেই। প্রথমে মোস্তাকের সর্বনাশা তাণ্ডব। তারপর এলেন আমাদের মহান সেনাপতিরা। একের পর এক। বড় ধাক্কাটা এল এক প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধারই হাত দিয়ে। তিনি ঘোষণা দিলেনঃ বিসমিল্লাহ। একটা শব্দ যে কত শক্তিশালী হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেল দেশ। একটা শব্দের ঘা'তে গোটা দেশটারই ভিত্তি নড়ে উঠল। যে-আদর্শের ওপর স্বাধীনতার জন্ম, যে আদর্শের জন্যে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালির জীবনদান, লক্ষ নারীর সর্বস্ব হারানো, সেই আদর্শই ভূলুন্ঠিত হয়ে গেল একটি শব্দের কশাঘাতে। এই মূর্খ সেনাপতির মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরী জেনারেল এরশাদ জাতির ক্ষতবিক্ষত শরীরের ওপর গেঁথে দিলেন তাঁর নিজস্ব বিজয়পতাকা---বললেন, বাংলাদেশ একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। অর্থাত্ কার্যত শরিয়ার শাসন, যেখানে অসতী-বলে-অভিযুক্ত নারীকে প্রস্তর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়, যেখানে সংখ্যালঘুরা লঘুতর জাতি এবং তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে সংখ্যাগুরুদের কৃপার ওপর, যেখানে মতান্তরের প্রশ্রয় নেই, যেখানে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার প্রশ্রয় নেই, নেই কোনও মৌলিক প্রশ্ন বা সংশয়বাদের প্রশ্রয়। সেই 'বিসমিল্লাহ' ও 'ইসলামিকের' ঢেউ যে একদিন আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে উত্তর আমেরিকার উপকূলে পৌঁছুবে সেটা তো অবধারিত।

তার প্রাথমিক লক্ষণ আমরা দেখতে শুরু করেছিলাম আশির দশকের গোড়াতেই। একটি দুটি করে আরবি পোশাক পরিহিত বাঙালি মুসলমান আবির্ভূত হতে শুরু করলেন অটোয়া-মন্ট্রিয়ল-টরন্টোতে। তারপর দলেদলে। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলপুষ্ট তবলিগি দলের সঙ্গে সোত্সাহে এবং সহর্ষে যোগ দিলেন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জামাতপন্থীরা। আমাদের ঘরে ঘরে সময়ে অসময়ে, রাস্তায়, বাজারে, নিমন্ত্রণ-খেতে, হুজুরেরা ধর্না দিতে শুরু করলেন। আমাদের আল্লার রাস্তায় ফিরিয়ে নেবার জন্যে তাঁরা বদ্ধপরিকর। 'আল্লার রাস্তায় ফেরানো' বলতে তাঁরা অবশ্য সত্পথে জীবনযাপনের কথা বলছেন না, বলছেন মসজিদে যাওয়ার কথা। তাঁদের কাছে 'আল্লার রাস্তা' মানে 'মসজিদের রাস্তা', 'সততা'র রাস্তা নয়। আমাদের মসজিদে নিয়ে যেতে পারলেই তাঁদের কর্মসিদ্ধি। দুয়েকবার এমনও অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের যে দেশ থেকে আগত হুজুরকে স্বদেশী ব্রাদারদের উদ্দেশ্যে দুটি ধর্মের বানী শোনাবার সুযোগ দেবার জন্যে 'বাকাওভের' কর্মকর্তাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ। একদিন আমারই কর্মস্থল, কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাখার অফিসে এসে দর্শন দিলেন পবিত্র মেহেদীরঞ্জিত শ্মশ্রুসুশোভিত এক বাংলাভাষী পাকিস্তানী (তার অর্থ কি সেটা সত্যিকার বাঙালি যারা তাদের কারও অজানা নয়)। তাঁর দিলের খায়েস আমার মত এক নাদান মুসলমানকে আল্লাপাকের তরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা, অর্থাত্ মসজিদের পথ দেখানো। হুজুরের সাথে আরো তিনচারজন বুজুর্গ ছিলেন যাঁরা উর্দুভাষী, মানে খাস পাকিস্তানী। বুঝতেই পাচ্ছেন ব্যাপারটা। হেভিডিউটি হেদায়েত যাকে বলে।

এভাবেই আস্তে আস্তে বাঙ্গালিত্বকে আড়াল করে মুসলমানিত্বের ছায়া ঘনাতে শুরু করল ক্যানাডা-আমেরিকার সামাজিক জীবনের ওপর। নব্বুইর দশকে এমনও হয়েছে দুয়েক জায়গায় যে বিজয় দিবসে জাতীয় সঙ্গীত না গেয়ে কোরান্ তেলোয়াত হচ্ছিল। জাতীয় সঙ্গীতের বড়

দোষ ওটা মালাউনের লেখা গান। অন্তত একটি শহরে শুনেছি রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনাতে কোরান পাঠ হয়েছে। কচিকাচাদের জন্যে সরকারপুষ্ট বাংলা স্কুলে কার্যত ইসলামি কায়দাকানুন শেখানো হচ্ছে তার উদাহরণ আমার নিজের চোখেই দেখা।

প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজ মূলত দেশেরই মত----ধর্মকর্মে যথেষ্ঠ নিষ্ঠাবান হলেও কট্টর গোঁড়ামি ছিল না কখনো। অন্যধর্মের প্রতি সহনশীলতা কেবল নয়, প্রচুর সম্মানবোধও ছিল। মুসলমানের উত্সবে হিন্দু বন্ধু আর হিন্দু উত্সবে মুসলমানের অংশগ্রহণ---সে তো আমাদের চিরাচরিত রীতি। কিন্তু আস্তে আস্তে, আরবের ওহাবী আর পাকিস্তানের মুওদুদী প্রভাবে, সেই সনাতন ধারাটি শিথিল হতে শুরু করল। বাঙালি মুসলমানদের চোদ্দ পুরুষের প্রচলিত বচন 'খোদা হাফেজ' হঠাত্ করেই 'আল্লা হাফেজে' রূপান্তরিত হয়ে গেল। মেয়েদের মাথায় শোভা পেতে লাগল 'হিজাব' নামক এক অবাংগালি শিরাবরণ। হিজাব শব্দটির উত্পত্তি কোথায় জানেন কেউ? আমি জানিনা। অনুমান করি মেয়েদের শালীনতার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে এটির। কিন্তু আমার মাবোন খালাফুফুদের কখনো 'হিজাব' পরতে দেখিনি। তাঁরা কি যথেষ্ঠ শালীন ছিলেন না? আজকে হিজাবের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে। হিজাব কি ধর্মের বিজ্ঞাপন? নাকি মুসলিম মেয়েদের নতুন কোনও ফ্যাশান? ইরান বা মধ্যপ্রাচ্যের রূপসী মেয়েরা যখন পরে তখন নেহাত মন্দ লাগে না, মনে হয় ওদের জন্যে এটা স্বাভাবিক পোশাক। কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়েরা, যারা সারাজীবন হিজাব পরেনি, হিজাব না পরেই যাদের মুসলমানিত্ব বিন্দুমাত্র কমে যায়নি, তারা যখন হঠাত্ করে হিজাব পরতে শুরু করে তখনই বুঝি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি বা অন্য কোনও বিশ্বাসের পাল্লা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। আমার নিজের পরিবারে কেউই 'আল্লা হাফেজ' বলেনি আগে, এখন বলে। আমি বলি 'খোদা হাফেজ', ওরা জবাবে বলে 'আল্লা হাফেজ'। তাদের মনে এমন একটা বিশ্বাস গেঁথে বসেছে যে 'খোদা হাফেজ' বললে আল্লা সেটা শুনতে পাননা,'আল্লা হাফেজ' বললে পান। 'খোদা' শব্দটি যে আরবি নয় সেটা আমি জানি। 'খোদা' শব্দটি এসেছে ফারসি 'খোদ' থেকে, যার মানে স্বয়ং। অর্থাত্ 'খোদা'র মানে স্বয়ম্ভূ---যা বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত অর্থের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু 'আল্লা'? একটি আরবি শব্দ, তার বেশি আমি জানিনা।

অবশ্য এসবের কোনকিছুতেই আমার আপত্তি তোলার কোনও অধিকার নেই, কারণও নেই। এটা যার যার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমার আপত্তি যখন সেটা সামাজিক জীবনকে ব্যাহত করতে উদ্যত হয়। ১৯৬২ সালে ক্যানাডার কোন শহরেই হালাল মাংস পাওয়া যেত না। গরুর মাংস ছিল, ভেড়া, ছাগল, মুরগি, খরগোশ শুকর, সবই ছিল, কেবল হালালটাই ছিল না। ধার্মিক মুসলমানদের খুব অসুবিধা হত তখন সেটা সত্য। আজকের দৃশ্য তার বিপরীত। হালাল ছাড়া মাংস পাওয়া যাবে না কোনও 'ভাল' মুসলমানের বাড়িতে। হালাল মাংসের ব্যবস্থা না থাকলে কারো বাড়িতে তারা নিমন্ত্রণ খেতে যান না। অমুসলমান বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে আপত্তি নেই, কিন্তু পাল্টা নিমন্ত্রণে যেতে তাদের ভীষণ দ্বিধা। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে খানাপিনার আয়োজন থাকলে অবশ্যই হালাল মাংসের ব্যবস্থা থাকতে হয়। কোন কোন মুসলমান আছেন যাদের মাসিক উপার্জনের একটি পয়সাও হয়ত সদুপায়ে অর্জিত নয় (যেমন ট্যাক্স ফাঁকির জন্যে সবসময় নগদ ব্যবসা করা, মিথ্যা ঘোষণায় সরকারি ভাতাভোগ) কিন্তু পাতের মাংসখানি তাঁর হালাল হওয়া চাই। এমনকি 'হারাম'মাংসখাওয়া বাসনপত্র ছুঁতেও

নারাজ তাঁরা। গোঁড়া আমরা আগে ছিলাম না, এখন হয়েছি। বিশেষ করে 'কাফেরের' দেশে আসার পর।

আজকে আমার এই প্রিয় শহরটিতে বাংলা অনুষ্ঠান বলতে কেবল 'দেশান্তরি'র অনুষ্ঠানকেই বোঝায়। বাংলাদেশীদের বাংলা অনুষ্ঠান প্রায় হয়না বললেই চলে। অনুষ্ঠান করতে হলে লোকবল লাগে, প্রতিষ্ঠান লাগে, লাগে টাকার জোর, মনের জোর। এসবের কোনটাই আর নেই আমাদের। বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেড়েছে শতগুণ, কেবল বাঙ্গালিরাই হয়েছে সত্যিকার সংখ্যালঘু। আমরা আর বাংলাদেশী বাঙালি নই, বাংলাদেশী মুসলমান। 'বাংলাদেশী' আর 'মুসলমান' শব্দদুটি যেন সমার্থক হয়ে পড়েছে। অনুষ্ঠান করতে হলে কোরাণ তেলোয়াত করতে হবে, দোয়াদরূদ পড়তে হবে।

একসময় আমরা ভীষণভাবে বাঙালি ছিলাম, এবং গর্বের সাথে ঘোষণা করতাম সেটা। এখন আমাদের অনেকেই সমান গর্বের সাথে পরিচয় দেয় বাংলাদেশী মুসলমান। আমরা পরিচয় খুঁজি বাংলার পলিমাটিতে নয়, আরবের মরুভূমিতে। আমরা উদগ্রীব হয়ে সন্ধান করি পূর্বপুরুষের কারো শরীরে আরবি তুর্কি বা পাঠান রক্ত ছিল কিনা। থাকলে আমাদের বুক ফুলে যায় গর্বে। 'আমার পূর্বপুরুষ কিন্তু আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন' বলতে পারলে আমাদের কারো কারো জীবন ধন্য হয়ে যায়।

আসলে এক অদ্ভূত উষ্ঠপৃষ্ঠে আরূঢ় জাতি আমরা, এক বিভ্রান্ত বিমূঢ় জাতি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের কবি বলতে লজ্জা পাই, বলি হিন্দু কবি (যা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়)। আমাদের বিচারে বিভূতিভূষণ, শরত্চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, এঁরা সবাই মুসলিমবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট লেখক। কেবল আমরাই সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মহত্ জাতি! আজকে অটোয়ার সবচেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ বাংলা ভাষাভাষী প্রতিষ্ঠান হল ইসলামী প্রতিষ্ঠান। অটোয়া-মুসলিম এসোসিয়েশন তো খুবই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছেন তাঁদের বাত্সরিক কর্মসূচি। তদুপরি আছে 'হালাকা' নামক এক নতুন জিনিস। শব্দটির অভিধানিক অর্থ আমি এখনও জানিনা ভাল করে। বাপদাদা চোদ্দপুরুষের কারো মুখ থেকে শুনিনি শব্দটা। শুধু জানি যে শব্দটির উত্পত্তি এক ইহুদী সংস্কৃতি থেকে---এর অর্থ ধর্মালোচনা। আজকে হালাকাদাররাই হলেন সবচেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠী। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে তরুনদের অনেকেই বেশ ধর্মপ্রান হয়ে উঠছে। আগে যাদের মেয়েরা নিঃশঙ্কচিত্তে ভারতনাট্যম পরিবেশন করত বাঙালি অনুষ্ঠানে, আজকে হয়ত তাদের পরিবারের মেয়েরাই হিজাব পরে বাইরে বেরুচ্ছে। নাচ তো একেবারেই না, এমনকি বাংলা গানও ছেড়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। তারা এখন নাত গাইছে, ইসলামি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে, আরবি শিখছে আরবি স্কুলে গিয়ে।

মনে হচ্ছে পাকিস্তান হেরে গিয়েও হারেনি, আর বাংলাদেশ জিতেও জেতেনি। এ কেমনতরো বিড়ম্বনা বলুনত ভাই। আমরা কি আবার কখনও বাঙালি হতে পারব?

অটোয়া,
৫ই অক্টোবর,'১০
মুক্তিসন ৩৯